**মুখোমুখি - শুভাঞ্জন বসু**

**১**

কুড়ি টাকায় চারটে সিগারেট কিনে ফেলার পর তপনবাবুর মনে হলো পকেটে দেশলাই নেই। দোকান ছাড়িয়ে চলে এসেছেন অনেকটাই। রাত প্রায় এগারোটা। এখন বোলপুরে কোথাও সিগারেটের দোকান খোলা পাওয়া যাবে কিনা কে জানে!

শান্তিনিকেতন থেকে বেরিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চললেন তিনি। স্টেশনের দিকে যদি কোনো দোকান খোলা পাওয়া যায়।

রাত বাড়ছে, শীতল হচ্ছে বোলপুর। হলদে ল্যাম্পপোস্ট জুড়ে ভিড় করছে শ্যামাপোকার দল আর তার চারপাশে হালকা কুয়াশার আস্তরণ ফেলছে বোলপুরের রাত। নীচ থেকে ল্যামপোস্টগুলো কে এক একটা আলাদা পাড়া বলে মনে হচ্ছে তপনবাবুর।

যেমন ছিল নিজের পাড়া, নিজের বাড়ি, নিজের মতো সবকিছু।

রামরতন বোস লেন। হালকা সবুজ রঙের দেওয়াল, একটা আধো আলোর টিউব আর দিনে দুপুরে রাতে চলতে থাকা ঘন্টার পর ঘন্টার আড্ডা। চোখ বন্ধ করলেও এই দৃশ্যটা এখনো স্পষ্ট ভেসে ওঠে তপন বাবুর চোখে।

দেশলাইয়ের কথা মনে পড়লো হঠাৎ। পকেটে চারখানা সিগারেট আছে কিন্তু জ্বালানোর মতো একটা দেশলাইও নেই। হোটেলের রুমেই ফেলে এসেছেন হয়তো। সামনে আবছা আবছা দেখতে পেলেন একটা সাইকেল খুব দ্রুত এগিয়ে আসছে এদিকে। সাইকেলটা যত সামনে এগিয়ে আসছে কালো কালো ছায়াটা তত মানুষের অবয়ব ধারণ করছে যেন। কিছুটা সামনে চলে আসার পর তপনবাবু হাত বাড়িয়ে দাঁড় করানোর চেষ্টা করলেন সাইকেলটাকে। থামলে হয়! এত রাতে মাতাল বা চোর ভেবে পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়ার সম্ভবনাই বেশি। পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল সাইকেলটা, এমন সময় তপনবাবু বললেন- 'দাদা, একটা দেশলাই হবে?'

সাইকেলটা পাশ কাটিয়ে খানিকটা দূরে গিয়ে দাঁড়ালো। দূর থেকেই খানিক্ষণ মেপে নিলো তপনবাবুকে। পকেট থেকে একটা দেশলাই বের করে ছুঁড়ে দিল তপনবাবুর দিকে। তারপর আবার যে ভাবে এসেছিল সে ভাবেই জোরে চালিয়ে বেরিয়ে গেল সামনের দিকে।

যাহ বাবা! পাগল নাকি? দেশলাইটা না নিয়েই চলে গেল? সে যাকগে। আপাতত আর চিন্তার কোনো কারণ নেই।বাঁচা গেল। খুব দরকার ছিল দেশলাইটার। সিগারেটটা জ্বালিয়ে তপন বাবু একটা বড় টান মারলেন তারপর আলো আঁধারীর বোলপুরে পেছনে ফিরে দেখতে থাকলেন সাইকেলে চাপা মানুষটার আবার ছায়া হয়ে যাওয়া। গত এক দুমাসের মতন।

মনটা ভারী হয়ে উঠলো। একটা বড় শ্বাস নিলেন উনি। কতগুলো দিন কেটে গেল নাহ এভাবেই? একটা পরিচয়, যা এই শরীরটা বছরের পর বছর পালন করে গেছে বিনা অভিযোগে তা যেন এক লহমায় শেষ। অস্তিত্ববিহীন। কেমন অচেনা হয়ে উঠছে নাহ্ আশপাশ? মনে হচ্ছে নাহ্ কার সাথে হাঁটছি একা একা? কার সাথে বেড়াচ্ছি, খাচ্ছি, ঘুমাচ্ছি? এই লোকটা কে? অচেনা লাগছে নাহ্ খুব!

লাগছে তো। ভীষণ অচেনা লাগছে। কিন্তু এই ষাটোর্ধ্ব বয়সটা এমন এক সময় যখন পুরোনোকে চাইলেও আঁকড়ে রাখা যায়না আর নতুনকেও টেনে নেওয়া যায়না কাছে। নির্বল নিশ্চুপ এক মুহূর্ত শুধু পরে থাকে হাতে। আর থাকে হেঁটে চলে যাওয়া। অতীতের ঠিক করে দেওয়া কোনো ভবিষ্যতের পথে।

**২**

তপন কুমার হালদার। কিন্তু পাড়ার সবার কাছে তিনি শুধুই তপনদা। পাড়া বলাটা বোধহয় ঠিক হবে না। শুধুই কি রামরতন বোস লেন? গোটা শ্যামবাজারের বহু লোকই একডাকে চেনে 'তপন দার চায়ের দোকান'।

বাংলাদেশ থেকে বাবার হাত ধরে কলকাতায় আসার পর শ্যমবাজারে কাকুর বাড়িতে সেই ছোট্ট একরুমের ঘর। মা মারা গিয়েছিল দুই কি তিন বছর বয়সে, যশোরে থাকতেই। তারপর বাবা, ছেলে মিলে আস্তে আস্তে গড়ে তুলেছিল কলকাতার গল্প।

তপনবাবুর এখনো মনে আছে মায়ের জমানো গয়নাগুলো বিক্রি করে বাবা খুব কমদামেই কিনে ফেলেছিল রামরতন বোস লেনের দোকানটা।

একদিন রাতের কথা খুব মনে পরে। প্রচন্ড গরম। ফ্যানের খুব একটা চল হয়নি তখনো ওই পাড়ায়। বাবা আর ছেলে শুয়ে আছে পাশাপাশি খাটে। গরমে ঘুম আসতে চাইছে না। বেশ কিছুক্ষণ চুপ্চাপ শুয়ে থাকার পর তপনবাবুর বাবা হঠাৎই তপনবাবু কে জিজ্ঞাসা করেছিল- 'গয়নাগুলো বিক্রি করে ঠিক করলাম তো রে?’

পাঁচ বছরের তপন বাবুর অপক্ক মাথা সহজাত প্রবৃত্তিতেই মাথা নেড়ে হ্যাঁ জানিয়ে, বাবাকে আস্বস্ত করেছিল সেদিন। কী বুঝেছিলেন কে জানে? কিন্তু তারপর থেকে গত প্রায় চল্লিশ বছর ওই অপক্ক 'হ্যাঁ'-র ওপর আরো হাজার পরিশ্রম আর 'হ্যাঁ'-র পর 'হ্যাঁ' যোগ করে গেছেন তিনি। সকাল সাতটা হোক বা রাত বারোটা, দোকান খোলার সময় হোক বা রাতে বাসন মাজার সময়, কোনোদিন তপনদার চায়ের দোকানে এসে চা না পেয়ে ফিরে যেতে হয়নি কাওকে। এমনি ছিল দিন।

বাবা মারা যাওয়ার পর শ্যমলী দেবীকে বিয়ে। দুই ছেলে মেয়ে, তাদের বড় করা, স্বপ্নগুলো সত্যি করা, কিছুতেই কোনো খামতি রাখেননি তিনি। বরং উপরয়ালার আশীর্বাদে দোকানটার সাথে অনবরত বাড়িয়ে গেছেন আর্থিক সচ্ছলতাও।

বাড়ি বাদে ওই চায়ের দোকানই ছিল তপনবাবুর এক এবং অদ্বিতীয় আস্তানা। কতরকমের মানুষ এসে ভিড় জমাতো দোকানের সামনেটায়। সকালবেলায় বাজার করে ফেরা শ্যমলবাবুরা, দুপুরের দিকে পাড়ার বেকার ছেলেগুলো আর সন্ধ্যা থেকে তো গোটা পাড়া এসে ভিড় জমাতো তপনবাবুর দোকানে।

ঠেকের আঁতুরঘর বললে হয়তো বিশেষ অত্যুক্তি করা হবে না।

একা হাতে সামলে গেছেন বছর দশেক। তারপর রামু বলে একজন সহকারী। দুপুরের দিকটায় ছেলে সুদীপও এসে বসতো মাঝে মাঝে দোকানে। ওই তপনবাবুর খাওয়া আর একটু গড়িয়ে নেওয়ার সময়টুকুন আর কি।

ছেলে চাকরি পেয়ে পুনে চলে যাওয়ার পর দুপুরের বিশ্রামটুকুও টেনে নিয়ে গেছেন দোকানের চার দেয়ালের মধ্যে| কিন্তু কোনোদিন বন্ধ রাখতে পারেননি। এই নিয়ে শ্যামলী দেবীর সাথে কি কম ঝগড়া হয়েছে!

এইভাবেই এতগুলো মানুষের সাথে একনাগাড়ে কাটছিল তপনবাবুর প্রতিদিন। অভাব কোনোদিনই তেমন মনে হয়নি। আড্ডাবাজ বাঙালি আর যাইহোক চায়ের থেকে মুখ ফেরাতে পারবেনা কোনোদিন।

শুধু এতগুলো বছর পেরিয়ে, এত ব্যস্ততার মধ্যে তিনি লক্ষ্য করতে ভুলে গিয়েছিলেন যে বাবার পরিচয়ে মুখ লোকাতে শুরু করেছে পুনেতে চাকরিরত তার ছেলে সুদীপ আর গাঙ্গুলিবাগানে স্বামীর বাইক থেকে শপিং করে নামা তার মেয়ে জাহ্নবী|

**৩**

২০১৭.. পুজোর কয়েকদিন পরের ঘটনা।

তপন বাবু বাজার থেকে মাংস কিনে ফিরছেন বাড়িতে। মেয়ে,জামাই, ছেলে সবাই এসেছে বাড়িতে। ছেলের বিয়ের জন্য মেয়ে দেখা হবে। সবাই নিজেদের মতো ব্যস্ত। শ্যামলী দেবীও দম নেওয়ার সময় পাচ্ছেননা একদম।

নিজের ছেলে আর মেয়েকে এখন একসাথে পাওয়া মানে স্বর্গ হাতে পাওয়া। এর সময় হয় তো ওর হয়না, ওর সময় হয় তো এর সময় হয়না। এবার অনেক বুজিয়ে সুঝিয়ে দুজনকেই একসাথে রাখা গেছে বাড়িতে। তার সাথে জামাই ও আছে।

জামাই অনেকবার বলেছিল আজকের বাজারটা ওকেই করতে দেওয়ার জন্যে কিন্তু তপন বাবু বাঁধ সাধলেন। এই সুযোগ হাতছাড়া করা যায়! আজ যেন শ্যামলী দেবী আর তপন বাবুর পরীক্ষার দিন। দুজনে মিলে বাকিদের চমকে দেওয়ার সুবর্ন সুযোগ।

ঘরে সকাল থেকেই মাংসের গন্ধে ভরপুর। তারপর লুচি ভাঁজার শব্দ। অদ্ভুত এক মাদকতায় মেতেছিলেন শ্যামলী দেবী আর তপন বাবু। হঠাৎ যেন অপ্রত্যাশিত রবিবার এসে পড়েছে পরিবারে।

ছেলে, পাশের ঘরে সকাল থেকেই ল্যাপটপে অফিসের অনকলে। মেয়ে জাহ্নবী মায়ের সাথে হাত লাগিয়েছে আর জামাই শেখর বারান্দায় বসে পেপার পড়ছে।

শেখরের মন বসছিল না পেপারে। কাল রাতে সুদীপের সাথে অনেক্ষন কথা হয়েছে কিন্তু ভাই বোন এখনো কেন বাবা-মা'র সাথে কথা শুরু করছেনা কে জানে! শেখর চেয়ারে বসেই উসখুস করছিল। বেলা প্রায় বারোটা বাজে। এইবার কথা শুরু না করলে দেরি হয়ে যাবে। সন্ধ্যায় বাড়িও ফিরতে হবে আবার। বারান্দায় বসেই শেখর জাহ্নবীকে ডাকলো চিৎকার করে। জাহ্নবী তখন তৃতীয়বার মনে হয় চা চাপিয়েছে সবার জন্য। শেখরের ডাক পেয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে।

জাহ্নবী জিজ্ঞাসা করলো- 'কী হয়েছে?'

শেখরের মাথাটা চট করে গরম হয়ে গেল। কী হয়েছে? সেটাও এখন বলে দিতে হবে এদের? নিজেদের কোনো খেয়াল নেই, সব কাজ বলে বলে করাতে হয়। গাঙ্গুলি বাগানের ফ্ল্যাটে থাকতে দিনের পর দিন কথা হয়েছে এ ব্যাপারে শেখরের মা বাবার সাথে। জাহ্নবী ‘না’ তো করেই নি বরং নিজে থেকে নতুন নতুন উপায় বের করেছে এই লজ্জা থেকে বাঁচবার জন্যে।

কাল রাতেও সুদীপের সাথে আলোচনার পর রাতে জাহ্নবীর সাথে অনেক্ষন কথা হয়েছে। রাত অব্দি ঠিক ছিল সকাল থেকেই কথা শুরু হবে। কিন্তু বেলা বারোটা বেজে গেল, এখনো হুসই নেই দুজনের একজনেরও।

থাক। এখন মাথা গরম করবার সময় নয়। আরো অনেক কঠিন সময় আসতে পারে। নিজেকে সামলে নিলো শেখর। মাথা ঠান্ডা করে বললো- 'বারোটা তো বাজে। আর কখন শুরু করবে কথা? দুপুরের খাওয়ার পর তো তোমার বাবা না ঘুমিয়ে এক দন্ড থাকতে পারে না।'

-'আরে দাঁড়াও না। তোমার নাহ সময়-জ্ঞান বলে একদম কিচ্ছু নেই। দেখছো সবাই রান্না বাড়ি নিয়ে ব্যস্ত। এখন যদি শুরুও করি অর্ধেক কথাই কেউ পাত্তা দেবে না। অপেক্ষা করো। ঠিক সময়ে আমি বলবো।'

জাহ্নবী আর দাঁড়ালো না। অগত্যা ওকে ভরসা করা ছাড়া আর তো কোনো পথও নেই শেখরের কাছে। বারান্দায় চুপ করে বসে একবার শুধু চিৎকার করে ভেতরে বললো- 'এক কাপ চা দিও'

ভেতর থেকে জাহ্নবী বললো- 'দিচ্ছি। অপেক্ষা করো। বাবার স্পেশাল চা হচ্ছে'।

ভেতর থেকেই তপন বাবুর হাসির আওয়াজ এলো। গর্বের হাসি। সুদীপের ভেতর থেকে বলে উঠলো- 'দিদি ওই চা করা এত সহজ হলে, বাবার চা লাখো মে এক হতোনা।'

বাড়ির ভেতরে হেসে উঠলো সবাই। শেখর বুঝে উঠতে পারলো না এরা কখন, কিভাবে বা কেমন করে বলবে তপনবাবুকে কথাগুলো।

**৪**

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় সবাই একসাথে বসেছে আড্ডায়। তপনবাবুও আজ দোকান বন্ধ রেখেছেন অনেকদিন বাদে। ছেলে আর বেশিদিন ছুটি পাবেনা মনে হয়। তার মধ্যে আজ বিয়ের কথাটা পাকাপাকি ভাবে আলোচনা করে নেওয়া খুব দরকার। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ ধরেই তিনি বুঝতে পারছেন ছেলে-মেয়ে-জামাই কিছু একটা যেন লুকোচ্ছে তার কাছ থেকে। তিন জনের চোখ বারবার না চাইতেই চলে যাচ্ছে তিনজনের দিকে। কিছু একটা গোপন যেন বাইরে আসতে চাইছে ভীষণভাবে।

খানিক্ষণ কথার পরপরই অদ্ভুত এক নীরবতা ছেয়ে যাচ্ছে সবার মধ্যে। যেন আসল কথাই বলা হয়ে উঠছে না। কিন্তু বলে ফেলা দরকার। তপনবাবু আর থাকতে পারলেন না এইভাবে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন- 'কী হয়েছে রে তোদের? কিছু বলবি?'

কেউ কোনো উত্তর দিলোনা। সুদীপ জাহ্নবী শেখর এর ওর দিকে তাকাচ্ছে। তিনজনই অপেক্ষা করছে কোনো একজনের কথা শুরু করার জন্যে। সুদীপের ফোন হঠাৎ বেজে উঠলো ঝনঝন করে। যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো ও। খুব দরকার ছিল একটু বাইরে গিয়ে কথা গুলো গুছিয়ে নেওয়ার। ফোন আসার সুবাদে একটু সময় পাওয়া গেল হাতে|

'আমি একটু কথা বলে আসছি'- বলে বাইরে বেরোতে যাবে, এমন সময় শেখর বললো- 'ভাই, বাবার সাথে কথাটা হয়ে গেলে ভালো হতো নাহ?'

খানিক্ষণ শেখরের দিকে তাকিয়ে থেকে সুদীপ আবার বসে পড়লো বিছানায়। আবার নীরবতা।

শ্যামলী দেবী বললেন- 'কী হেঁয়ালি করছিস তোরা বলতো? কি হয়েছে খুলে বলনা'।

কেউ কোনো কথা বলছে না। শেখর বুঝতে পারছিল যে ছেলে আর মেয়ের পক্ষে এই কথাগুলো বাবার সামনে দাঁড়িয়ে বলা সম্ভবও নয়। অগত্যা সেই শুরু করলো বলা।

-'বাবা, আপনার সাথে কিছু কথা আছে আমাদের। আমাদের বলতে, আমার, আপনার মেয়ে আর সুদীপের। কিন্তু আগেই বলে রাখি, কথাগুলো কোনো ভাবেই আপনাকে অসম্মান করা বা কষ্ট দেওয়ার জন্যে নয়। আর... মানে... বলতে গেলে আপনার ছেলের সামনেই বিয়ে। আপনার মেয়েও অন্য রকম ভাবে জীবন কাটাতে চাইছে তাই তাদের কথাও যদি আপনি ভাবেন...'

কথা শেষ করতে পারলো না শেখর। তার আগেই তপনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন- 'হ্যাঁ হ্যাঁ সব বুঝেছি। এবার বলো কথা'টা কী?'

জাহ্নবী এর চুপ থাকতে পারলোনা। বাবা এমনিতেই একটু রাগী। তারমধ্যে ও জানে এত হেঁয়ালি করে কথা বলা বাবার একদম পছন্দ নয়। তাই এবার নিজেই শুরু করলো বলা। ঘটনার রেশ যতদূর নিজেদের কাছে রাখা যায় ততই মঙ্গল। জাহ্নবী বললো- 'আসলে বাবা, ও বলতে চাইছিল যে তোমার তো বয়েস প্রায় অনেকটাই হলো। আমাদের বড় করলে, আমরা নিজেদের পায়ে দাঁড়ালাম, ভাইয়েরও একটা ভালো জায়গায় চাকরি হলো। এবার তো তুমি একটু ঝাড়া হাতপা হয়ে বাড়িতেই বিশ্রাম নিতে পারো।'

তপন বাবু বললেন- 'মানে? আমি কি তোমাদের একবারের জন্যও বলেছি যে আমার বিশ্রাম চাই বা আমাদের দায়িত্ব নাও?'

-'না বাবা। তুমি ভুল বুঝছো কেন? তুমি আর কতদিন এই ভাবে ঘন্টার পর ঘন্টা খাটবে বলো তো? বয়েস বলে তো একটা ব্যাপার আছে নাকি! মা'রও বয়েস বাড়ছে। আমাদের দায়িত্ব আর নিতে হচ্ছেনা। এখন তো তোমার এত খাটাখাটনীর কোনো কারণ নেই|'

-'কারণ নেই কে বললো? আর দোকানটা তো আমার কোনো সরকারি চাকরি নয় বা কোনোদিনই ছিলোনা। আমি ভালোবাসি দোকানে বসতে। সবাইকে চা বানিয়ে দিতে। সবার সাথে আড্ডা মারতে। সেখানে আমার বিশ্রাম নিয়ে যদি বলো তবে আমি বলে রাখি ওই চা বানানোই আমার বিশ্রাম। কাজেই আমাদের দরকার নেই এসবের। কি বলো তুমি?'

শ্যামলী দেবী মাথা নেড়ে সায় দিলেন নিজের। জাহ্নবী বুঝতে পারলো ওর কথা বলার ধরণে বাবা বুঝতেই পারেনি আসল কথাটা। কী ভাবে বললে যে বুঝতে পারবে তাও ঠিক করে বুঝে উঠতে পারছেনা। সুদীপও বসে আছে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে। একটা কথাও বলছে না। তখন থেকে শুধু মোবাইল ঘেঁটে চলছে বসে বসে। আবার কি নতুন করে বলা শুরু করবে? উত্তর ভাবতে ভাবতেই বাবা হঠাৎ বলে বসলো- 'যাইহোক তোমাদের কথা যখন শেষ হয়ে গেছে তখন আমরা সুদীপের বিয়ে নিয়ে আলোচনা শুরু করি?'

তিনজন তাকালো একে অপরের দিকে। শেখর জানতো এই দুজনের পক্ষে সম্ভব নয় কিছু। আর তার খারাপ বা ভালো হওয়ার কোনো প্রচেষ্টাও নেই শ্বশুর শ্বাশুড়ির কাছে। কাজেই এবার নিজে থেকে দ্বায়িত্ব নেওয়ার সময় এসে গেছে। শেখর জানে সুদীপ বা জাহ্নবীর না হলেও তার নিজের পরিবারের কাছে শ্বশুরের এই পরিচয় কতটা লজ্জাজনক। শেখর বললো- 'বাবা একটু দাঁড়ান। বিয়ের কোথায় আসার আগে আমাদের কথাগুলো আরো একবার পরিষ্কার করে বলি। সুদীপের বিয়ের আগে এই কথা গুলো বলে নেওয়া প্রচন্ডভাবে দরকার। কাজেই আপনি যেমন সোজা কথা সোজা ভাবে বলতে ভালোবাসেন, আমিও ঠিক সেই ভাবেই বলতে চাই। সেক্ষত্রে কোনো কথা যদি আপনার খারাপ লাগে থাকে বা কষ্ট দিয়ে থাকে তার জন্যে আমি আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।'

তপন বাবু চেয়ার ঠিক করে সোজা হয়ে বসলেন। শেখরের কথায় তিনি বারবার শুনছেন আমি-আমি না করে শেখের বলছে আমাদের-আমাদের। তারমানে যা কথা সেটা তিনজনের মিলিত ভাব। তিনি বললেন- 'হ্যাঁ একদম ঠিক। আমি এক কথায় মানুষ। সোজাসাপটাই কথা হোক'।

-'ঠিক। আমরা তিনজন মিলেই ঠিক করেছি, মানে ঠিক অনুরোধ না'বলাই ভালো হবে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আপনার চায়ের দোকানটা এবার বন্ধ করতে হবে। বিক্রি করবেন না ভাড়া দেবেন সেটা একান্ত আপনার আর মা'র সিদ্ধান্ত কিন্তু আপনার এই চায়ালার পরিচয় আমরা আর বহন করতে রাজি নই'।

কতক্ষন বললো শেখর? বড়জোর এক-দেড় মিনিট হবে। কিন্তু এই এক-দেড় মিনিটেই জীবনের সব কিছু একবারে যেন নাড়িয়ে দিলো তপনবাবুকে। সামনে বসে থাকা ছেলে মেয়ে এক লহমায় যেন হয়ে গেল প্রতিবেশীর মতো পরিচিত। যাদের মুখ দেখলেই চেনা যায় কিন্ত জানা যায়না। জানতে ইচ্ছেও করে না খুব একটা। এত নির্দ্বিধায় বসে আছে সুদীপ আর জাহ্নবী! প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে ওদের পাশে থেকেছে তপনবাবু। শুধু বাবার মতো বলা হয়তো ভুল হবে, বন্ধুর মতো মিশেছে চিরকাল। কোনোদিন কোনো অভাব বুঝতে দেয়নি কাউকে। আর তারপর এই? কেমন করে এই ঘরে, এক ছাদের তলায় মানুষ হলো এরা? যারা খেলার শেষে নির্দ্বিধায় ভেঙে ফেলতে পারে খেলনা! তপনবাবু আর চেপে রাখতে পারলেন না নিজেকে। তিনি বললেন-

'তোমরা তাহলে আমার চায়ালার পরিচয়ে লজ্জা পেতে শুরু করেছো?'

কেউ কোনো উত্তর দিলো না। উত্তরের আশাও করেননি তপনবাবু। অনেকসময় নীরবতাই হ্যাঁ জানিয়ে দেয়। শ্যামলী দেবী বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। দরজার ফাঁক দিয়ে তপনবাবু দেখলেন শাড়ির আঁচলটা চোখের কোনে মুছিয়ে দিলো কোলে করে বড় করা সুদীপের আর বিয়ের দিন গাড়িতে ওঠার আগে জাহ্নবীকে জড়িয়ে ধরে অঝোরে কান্নার স্মৃতি। আস্তে আস্তে এই মিষ্টি মধুর স্মৃতিগুলো বাড়ির দরজার চাবির সাথে স্থান করে নেবে শাড়ির আঁচলে। কান্নার সাথে সাথে। যেই স্মৃতিগুলো আর কান্না হতে পারবে না তাদেরকেই নাম দেওয়া যাক ‘পরিবার’।

তপনবাবু অনেক্ষন বসে ছিলেন চুপ করে। বাবাকে এইভাবে প্রথম দেখছে জাহ্নবী। কাছে আসার ইচ্ছে ছিল কিন্তু সাহস পাচ্ছিলনা। দূর থেকেই জাহ্নবী বললো- 'বাবা আসলে তোমার নাতিও তো বড় হচ্ছে। ওকেও তো একদিন না একদিন জানাতেই হবে। আর ভাইয়ের বিয়ের ব্যাপার তো আছেই। যতই ভালো চাকরি করুক, তোমার পরিচয়ে তো ভাইয়ের শ্বশুরবাড়িতে অসুবিধা হলেও হতে পারে। তুমি প্লিজ একবার ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখো আমাদের ব্যাপারটা।'

খানিক্ষনের নীরবতা। সুদীপ এখনো একটা কথাও বলেনি। বলতো না'ও বোধহয়। যদিনা তপনবাবাবু ওকে জিজ্ঞাসা করতো- 'সুদীপ, তোমারও কি এক মত?'

মাথা নিচু করেই সুদীপ মাথা নাড়িয়ে হ্যাঁ জানালো।

তপনবাবুর হঠাৎ মনে পরে গেল বহুদিন আগের এক কথা। ঠিক এমনি এক দিনে পুজোর ঠিক পর পর। তপনবাবু আর তপনবাবুর বাবা পাশাপাশি শুয়ে ছিলেন খাটে। তপনবাবুর বাবা মা'য়ের গয়না বিক্রি করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন- 'ঠিক করলাম তো রে?' তপনবাবু সেদিন ঠিক এইভাবেই সুদীপের মতো মাথা নাড়িয়ে হ্যাঁ জানিয়েছিল বাবাকে। দুই প্রজন্মের দুই 'হ্যাঁ'। এক প্রজন্ম সব হারিয়ে চেয়েছে পরিচয় গড়ে তুলতে আর এক প্রজন্ম পরিচয় হারিয়ে চেয়েছে সব গড়ে তুলতে। মাঝে বয়ে গেছে 'বিশ্বাস' নামের খরস্রোতা নদী।

**৫**

'কি হয়ে গেল না?' - খাটে শুয়ে জিজ্ঞাসা করলো তপনবাবু। শ্যামলী দেবী কোনো উত্তর দিলেন না। চুপ করে শুয়ে থাকলেন তপনবাবুর পাশে। কী বা বলতে পারেন এই সময়।

মাথার ওপর ঘ্যাট ঘ্যাট করে পুরোনো ফ্যানটা ঘুরছে। একটু শীত শীত করছে। তবু বন্ধ করতে ইচ্ছে করছেনা ফ্যানটা। মনে হচ্ছে শব্দটা হলেই যেন ভালো হয়। তাতে সব প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে চলে যেতে পারবেন তিনি। নিজের কাছে কি কোনো উত্তর আছে দেওয়ার মতো শ্যামলী দেবীর? নেই। তাহলে কী ভাবে পাশে থাকবেন তপন বাবুর!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটু এগিয়ে এলেন তপন বাবুর দিকে। তপনবাবুর বুকের ওপর হাত রেখে বললেন- 'শোনো না, একটা কথা বলি?'

-'বলো'।

-'বলছি তুমি আর ওদের ওপর রাগ করে থেকো না। বাচ্চা মানুষ, বলে ফেলেছে।'

-'আর কতদিন শ্যামলী, ওদের বাচ্চা করে রাখবে? বড় হয়ে গেছে। অনেক বড় হয়ে গেছে।'

-'আহা! তুমি আবার কেন মন খারাপ করছো? একটু ওদের কথাটাও ভাবো।'

খানিক্ষণ চুপ থেকে তপনবাবু বললেন- 'তাই তো করে গেছি শ্যামলী চিরকাল'।

আর কোনো প্রশ্ন, উত্তর, কথা কিচ্ছু খুঁজে পেলেন না শ্যামলী দেবী। কী বলবেন? কী জানতে চাইবেন? প্রত্যেকটা দিন, প্রত্যেকটা মুহূর্তে তিনি দেখে গেছেন ছেলে মেয়ের প্রতি তপন বাবুর ভালোবাসা। কী অনায়াসে তিনি করে ফেলেছিলেন জীবনের সাথে আপস।

সব শখ, স্বপ্নের সাথে যোগ করে ফেলেছিলেন সুদীপ আর জাহ্নবীকে। 'বাবা বেলুন কিনে দাও' থেকে 'বাবা, একটা বাইক না হলে আর চলছেই না' কোনো কিছুরই অভাব হতে দেয়নি কোনোদিন।

আর আজ! কি নির্দ্বিধায় বলে ফেললো নাহ কথাগুলো?

লোকটার নিজের বলে সত্যি কি কিছু ছিল কোনোদিন?

হ্যাঁ ছিল।

শ্বশুরের বানিয়ে দেওয়া ওই চায়ের দোকানটা। ওই চায়ের দোকানে প্রতিটা ইঁটে ছিল তপন বাবুর মায়ের গয়নার ঝন-ঝনানী। প্রত্যেকটা কাপে ছিল তার কাস্টমারদের সাথে অবিরাম আড্ডার এক ঝলক। ভীষণ ভালোবাসায় কাটিয়ে দিতেন তিনি ওই দোকান ঘরে। ভীষণ যত্নে সারাক্ষন ভরিয়ে রাখতেন রামরতন বোস লেনের 'তপনদার চা'য়ের দোকান'।

পারবেন এসব এক লহমায় ছেড়ে দিতে? ভুলে যেতে ভালোবাসার প্রত্যেকটা মুহূর্ত?

জানেননা শ্যামলী দেবী। তপন বাবুর দিকে তাকালেন একবার। একভাবে তাকিয়ে আছেন ঘুরন্ত ফ্যানটার দিকে। কত'কি কথা ভাবছেন কে জানে!

শ্যামলী দেবী জিজ্ঞাসা করলেন- 'কিগো? কী ভাবছো এত?'

একটু খানিক্ষণ চুপ থাকার পর তপন বাবু বললেন- ' ওদের বলে দিও দোকানটা আমি বিক্রি করে দেব। আর কাল রামু কে নিমন্ত্রণ করবো বুঝলে, রাতে। ছেলেটার আমি ছাড়া তো আর কেউ নেই। দোকানটা চলে গেলে ও কী করবে কে জানে?' কথাটা বলে একটা দীর্ঘশ্বাস নিলেন তপন বাবু। তারপর শ্যামলী দেবীকে আড়াল করে পাশ ফিরে শুলেন।

শ্যামলী দেবী দেবী বুঝতে পারলেন না তপন বাবু সত্যি কি শুধু রামুর কথাই বললেন? নাকি রামুর নামের আড়ালে যোগ করে দিলেন নিজের নামটাও। বুঝতে পারলেন না তিনি। শুধু যেটা মনের ভেতর উপলব্ধি করতে পারলেন তা হলো- ‘সব ভালোবাসাই প্রেম, কিন্তু সব প্রেম ভালোবাসা নয়।’

চায়ের দোকানের সাথে তপনবাবুর সম্পর্ক তবে প্রেম না বলে ভালোবাসাই বলা যাক। যেমন একপেশে ভালোবাসা থাকে বাবা-মা'র সন্তানদের জন্য।

**৬**

চারটে সিগারেট কিনেছিলেন, আর একটা বাকি। রাত কত হয়েছে জানেন না তপন বাবু। একটা বা দুটো তো হবেই। হোটেলে সবাই ঘুমোচ্ছে। কাওকে কিচ্ছু না জানিয়েই বেরিয়ে এসেছিলেন তিনি। মনটা যেন কেমন কেমন করছিল। তারপর থেকেই বোলপুরের পথ ধরে হাঁটছেন উনি। প্রথমে একটা দেশলাই পাওয়ার লক্ষ্য ছিল, তারপর থেকে লক্ষ্যহীন হয়ে। জীবনের সাথে যেমন হয়ে থাকে মাঝেমাঝে|

হাটতে হাটতে বোলপুর স্টেশনের কাছে এসে বসেছিলেন। ফাঁকা ফাঁকা। কুয়াশায় ঢাকা স্টেশন চত্বর। একদুটো টোটো এপাশ ওপাশে ছড়ানো। আর কয়েকটা লোক এক জায়গায় গোল করে বসে আড্ডা মারছে। মাঝে জ্বলছে আগুন। তাতে হাত সেঁকে নিচ্ছিল সবাই।

ওদের ঠিক পাশেই বোলপুরী শাল গায়ে জড়িয়ে বসে আছে একটা চায়ালা। ছোট্ট একটা স্টোভে চা বানাচ্ছে, ওই আগুনেই হাত সেঁকছে আর মাঝে মাঝে ঘুরে তাকাচ্ছে তপন বাবুর দিকে।

তপনবাবু খেয়ালই করতে পারছেন না, তিনি একটানা প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে তাকিয়ে আছেন ওদিকে। চায়ালা ভাবছে লোকটা পাগল-টাগল নয়তো! নইলে এমন ভাবে কে তাকিয়ে থাকে?

এমন ভাবতো না, যদি ও জানতো এই লোকটা কলকাতায় শেষ করে এসেছে তার অকৃত্রিম ভালোবাসা। জানে না ছেলে মেয়ে আর জামাইয়ের মুখ লুকানোর ভয়ে তিনি পরের দিনই শেষ করে ফেলেছিলেন 'চায়ালা'-র তকমা। কাওকে কিচ্ছু না জানিয়ে। কাওকে কিচ্ছু না বলে। সেদিন যথারীতি ছিল প্রতিদিনকার মতো আরো একটা দিন। সকাল থেকেই কাজে বিভোর ছিলেন তপনবাবু। যতক্ষন পেরেছেন নিজে হাতে সব কটা চা বানিয়েছেন। সবার সাথে আড্ডা মেরেছেন। নিজে হাতে ধুয়েছেন প্রত্যেকটা কাপ। রামু বুঝতে পেরেছিল বোধহয়। শেষবেলায় যখন তপনবাবু বললেন দোকান বন্ধ করার কথা তখন রামু আর চোখের জল আটকাতে পারেনি।

হায়! তপনবাবুও যদি এইভাবে একটু কাঁদতে পারতেন।

পারেন নি। আর পারবেন নাও বোধহয় কোনোদিন। ওই কান্নাগুলো বুকে জমাট বেঁধে আঁকড়ে রাখবে দোকানের সব কটা স্মৃতি।

ওই যারা প্রতিদিন চা খেতে আসতো দোকানে বা যাদের ঠেক বলতে ছিল তপনদার দোকান তারাও জানতে পারেনি কিছু। জেনেছে, কয়েকদিন পর এর ওর কান ঘুরে ঠিক পৌঁছে গেছে খবর। কিন্তু এমন তো কতই হয়। মানুষ বড় জলদি মানিয়ে নেয় নিজেকে। যোগ্যতমের উদবর্তন।

তপন বাবুও যোগ্য তবে। তিনিও এক মুহূর্তে শেষ বারের মতো দোকানে তালা লাগাতে লাগাতে বুঝে ফেলেছিলেন আর কোনোদিন ইস্টবেঙ্গল বনাম মোহন বাগানের লড়াইয়ে মেতে উঠবে না তার চায়ের দোকান। তৃণমূল বা সিপিএম হয়ে কোনো আড্ডা পৌঁছে যাবেনা আমেরিকার দোড়গোড়ায়। মুহূর্তে আরো পাঁচ কাপ স্পেশাল চা কেউ চাইবেনা নতুন চাকরি পাওয়ার পর। কেউ আর বাকি রাখবে না তার কাছে। কেউ আর বন্ধুদের কোনোদিন বলবে না –‘তপনদার দোকানে আয়’।

আর কোনোদিন তপনবাবু নিজে দোকান বন্ধ করার আগে দেওয়ালে টাঙানো বাবা-মা'র ছবির দিকে তাকিয়ে বলবে না- 'সব ঠিক আছে তো? '

শেষ। আর কোনোদিন নতুন কোনো স্বপ্ন গড়ে উঠবে না চায়ের দোকান ঘিরে। তপন বাবুর নিজেরও না। তাতেই তো বোধহয় আনন্দে থাকা যায়! অন্তত শেখর আর জাহ্নবী তো সেই জন্যই শান্তিনিকেতনে নিয়ে এসেছে বাবা-মা'কে। যাতে পুরোনো কষ্ট ভুলে থাকা যায়।

কিন্তু ওরা হাজার চেষ্টাতেও বোঝাতে পারেনি কী'ভাবে নিজেকে ভুলে থাকা যায়! কীভাবে নিজের সামনে পরার আগেই পালিয়ে যাওয়া যায়! কীভাবে নিজের পরিচয়টাকেও ঘেন্না করা যায়!

বোঝাতে পারেনি। আর পারবেও না কোনোদিন। তপন বাবু আরো হাজার বার এমনভাবেই বেরিয়ে আসবে রাস্তায়। একা একা হাঁটবে রাতের বেলায় সব চুপ হয়ে গেলে। যেখানে লজ্জা-ঘৃণা-ভয়, কিচ্ছু নেই।

-'দাদা, চা খাবেন?'

চমকে উঠলেন তপন বাবু। এইসব ছাইপাশ ভাবতে ভাবতে বুঝতে পারেননি উল্টোপাশে চায়ালার কখন উঠে এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে চায়ালা। পাগল ভাবছে নাকি! ভাবলে ভাবুক। কি এসে যায় তাতে? অচেনা লোকের সামনে লজ্জা পেয়েও বা কি হবে?

ইস! পৃথিবীতে সবাই অচেনা হলে কি ভালোই হতো তাই না? সবাই ছোটবেলায় যে-যার মতন 'যেমন খুশি সাজো'-র খেলায় মেতে উঠতে পারতাম!

চায়ালা আবার জিজ্ঞাসা করলো- 'চা খাবেন? এই খানে কি করছেন আপনি?'

তপনবাবু খানিক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন লোকটার দিকে। তারপরে কেটে কেটে শুধু একটা বাক্যই বললেন- 'আমাকে এক কেটলি চা বানাতে দেবেন?'

কোথায় যেন হঠাৎ করেই একটা বাউল গেয়ে উঠলো-

'কাষ্ঠ-নলে দাবানল পোড়ায় কত বন জঙ্গল

মন পোড়ানোর আগুন বন্ধু তাহা নয়

কত বিরোহিনীর অন্তর তলে

বিনা কাষ্ঠে আগুন জ্বলে

জ্বলে গেলে- জ্বলে দ্বিগুন

নিভে না, সে তো নিভে না'

কে গাইলো? কোনো বাউল তো ছিল না আশেপাশে! মনের বাউলটা হঠাৎ গেয়ে উঠলো নাকি তবে!

**-সমাপ্ত-**

**Contact Details-**

Subhanjan Basu

C.O- Sanat Kumar Basu

Chalsa Salbani Sangha, Upper chalsa  
P.O- Chalsa

Dist- Jalpaiguri

Pin- 735206

Phone- 7980092719/8536015411

Email- Subhanjan.basu12@gmail.com